মাতৃপ্রসঙ্গ

দেবী দুর্গা ও শ্রীশ্রীমার স্বরূপ চিন্তন

শিখা মুখোপাধ্যায়

আশ্বিন মাসে অনুষ্ঠিত যে উৎসবটি আপামর জনসমাজকে উদ্‌বেলিত করে তার কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করছেন ষড়ৈশ্বর্যময়ী পরমেশ্বরী দুর্গা। শুধু শরৎকালে নয়, বসন্তঋতুতেও তাঁকে ষোড়শোপচারে অর্চনা করা হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে একই দেবীকে দুবার পূজা করার কারণ, তিনি দুর্গতি থেকে সবাইকে যেন ত্রাণ করেন। শরৎ, বসন্ত দুটি ঋতুই সাধারণভাবে স্বাস্থ্যের দিক থেকে পীড়াদায়ক। ওইসময় নানা ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইজন্য ওই দুটি ঋতুর নাম 'যমদংষ্ট্রা'। কৃষ্ণযজুর্বেদে শরৎকালের ভীষণ মহামারিকে লক্ষ করে এই ঋতুকে বলা হত 'হিংসিকা অম্বিকা'। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে দুর্গাপূজা শরৎকালীন রুদ্রযজ্ঞেরই পরিবর্তিত রূপ। বাজসনেয়সংহিতা অনুসারে শরৎকাল দুর্গাপূজার জন্য প্রশস্ত। শারদীয়া পূজার গুরুত্ব স্বীকার করে দেবীভাগবতে বলা হয়েছে—

''শরৎকালে বিশেষেণ কর্তব্যং বিধিপূর্বকং
বসন্তে চ প্রকর্তব্যং তথৈব প্রেমপূর্বকম্।
দ্বাবৃতূ যমদংষ্ট্রাখ্যৌ নূনং সর্বজনেষু বৈ
শরৎ-বসন্ত-নামানৌ দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ॥
তস্মাৎ তত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপূজনং বুধৈঃ॥'' (৩।২৬)

যমভয় নিবারণের জন্য বিশেষভাবে দেবী দুর্গার পূজার্চনায় জোর দেওয়া হয় কারণ তিনি মহাভয়-নিবারিণী। দুর্গা শব্দটির বর্ণবিশ্লেষণে পাই দ্‌ + উ + র্‌ +গ্‌ + আ। প্রতিটি অক্ষরের বিশেষ অর্থ আছে—

''দৈত্যনাশার্থো বচনো দকারঃ পরিকীর্তিতঃ
উকারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদসম্মতঃ।
রেফো রোগঘ্নবচনো গশ্চ পাপঘ্নবাচকঃ
ভয়শত্রুঘ্নবচনশ্চাকারঃ পরিকীর্তিতঃ॥''

দ-কারের অর্থ দৈত্যনাশ, উ-কারের অর্থ বিঘ্ননাশ, র-এর অর্থ রোগনাশ, গ-কার পাপনাশ এবং আ-কারের অর্থ ভয় ও শত্রুবিনাশ। অর্থাৎ জাগতিক সবরকম পীড়া যিনি নাশ করেন তিনিই দুর্গা। তাই তাঁর পূজায় এত গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে।

নিজের নাম প্রসঙ্গে স্বয়ং দেবী বলেছেন চণ্ডীতে—

''তত্রৈব চ বধিষ্যামি দুর্গমাখ্যং মহাসুরম্।
দুর্গা দেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি।''

আমি যখন দুর্গম নামে মহাসুরকে বধ করব তখন দুর্গা দেবী নামে বিখ্যাত হব। ব্যাকরণগত ব্যাখ্যায়—দুঃখেন গম্যতে যা সা দুর্‌ উপসর্গাৎ গমধাতোঃ স্ত্রিয়ামাপ্‌ ঈপ্‌ বেতি। দুর্গা বা দুর্গি শব্দের এইটি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ। দেবীর কাছে পৌঁছানোর পথ দুর্গম। আবার তিনি দুর্গমকে সুগম করে দেন পরম কৃপায়। তাই দুর্গম নামক মহাসুরকে তিনি বধ করেন ভক্তকে অনুগ্রহ করার জন্য। দুর্গি শব্দের প্রয়োগ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের যাজ্ঞিকা উপনিষদে দুর্গাগায়ত্রীতে দেখি—''কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যাকুমারিং ধীমহি, তন্নো দুর্গি প্রচোদয়াৎ।'' (তৈত্তিরীয় আরণ্যক মতে)

মূল ঋগ্‌বেদে স্পষ্টভাবে দুর্গার নামোল্লেখ না থাকলেও খিলকাণ্ডে অর্থাৎ পরিশিষ্টে তা আছে।

ঋগ্‌বেদের রাত্রিসূক্তে রাত্রির চৈতন্যস্বরূপত্ব বোঝানোর জন্য ঋষি তাকে দেবী বা দ্যোতমানা বলেছেন। পরবর্তী খিলমন্ত্রগুলিতে ক্রমশ জননী, শরণ্যা, দুর্গা নামে রাত্রিকে অভিহিত করা হয়েছে। রাত্রি দেবীর দুর্গারূপতা খুব স্পষ্টভাবে প্রতীত হয়েছে নিম্নলিখিত খিলমন্ত্রে—

''তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্।
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ॥''

অর্থাৎ যিনি অগ্নিবর্ণা, তপস্যার তেজে দীপ্যমানা, বিশেষ দ্যুতিময়ী, সর্ববিধ কর্মফলপ্রাপ্তির জন্য সকলে যাঁকে আশ্রয় করে সেই দুর্গা দেবীর শরণ গ্রহণ করি কারণ তিনি সহজে সর্ববিপদ থেকে উত্তীর্ণ করতে সমর্থা। এই মন্ত্রটিতে দুর্গার সম্পূর্ণ স্বরূপ যেভাবে ফুটে উঠেছে তাকে অবলম্বন করে পরবর্তী কালে আমাদের দুর্গাভাবনা পরিপুষ্টিলাভ করেছে। পণ্ডিতেরা মনে করেন 'দুর্গাসপ্তশতী' বা দেবীমাহাত্ম্য মূলত বেদভিত্তিক। এর তিনটি চরিত্রের প্রথমটি ঋগ্‌বেদস্বরূপ, মধ্যমটি যজুর্বেদস্বরূপ এবং উত্তর চরিত্রটি সামবেদস্বরূপ। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদেও দুর্গা দেবীর নাম পাওয়া যায়।

এরপরে রামায়ণে এবং মহাভারতে দুর্গাপূজার কথা পাই। মহাভারতে একাধিকবার দুর্গাস্মরণের উল্লেখ আছে। বিরাটপর্বের ষষ্ঠাধ্যায়ে অজ্ঞাতবাসের সাফল্যের জন্য যুধিষ্ঠিরকৃত স্তুতিতে দেবী মহিষাসুরমর্দিনী, বিন্ধ্যবাসিনীরূপে বন্দিতা হয়েছেন। এছাড়া মহাভারতে বিভিন্ন স্থানে-কালে কুমারী, কালী, মহাকালী, চণ্ডী, কান্তারবাসিনী প্রমুখ নামে দেবী আরাধিতা হয়েছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে যুদ্ধজয়ের জন্য অর্জুন স্বরচিত দুর্গাস্তব পাঠ করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবতে এবং দেবীমাহাত্ম্যে দেবীকে বিষ্ণুমায়া, মহামায়া ও যোগমায়া বলা হয়েছে একাধিকবার। মহামায়াই ঋষি কাত্যায়নের আশ্রমে কাত্যায়নীরূপে বিরাজিতা। ব্রজবালাদের কাছে তিনি কামদা। বিশ্বসারোদ্ধারতন্ত্রে দেবী প্রকৃত অর্থে ত্রাণকর্ত্রী। সেখানে বলা হয়েছে—হে দেবি! তুমি নিরাশ্রয়, তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত, ভীত, বদ্ধজীবের একমাত্র গতি ও নিস্তারকারিণী। অরণ্যে, দারুণ রণক্ষেত্রে, শত্রুমধ্যে, অগ্নিতে, সাগরে, দুর্গমস্থানে, রাজদ্বারে একমাত্র তুমিই রক্ষাকর্ত্রী।

এই দুর্গার সঙ্গে জীবকে একটা নিশ্চয়াত্মিকা সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। মানুষের মনে সর্বপ্রথম জনক-জননীজ্ঞানের উদয় হয় : ''জননীজনকৌ সম্যক্ সম্বন্ধঃ প্রথমো বিধিঃ'' (অগস্ত্যসংহিতা)। এই জ্ঞানের উদয় হলে মা দুর্গা করুণা, ক্ষমা, বাৎসল্যাদি গুণবিশিষ্টা—এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। তখন ঐহিক জননীর কাছে ক্ষুধার্ত সন্তান যেমন বিনা সংকোচে খাদ্য চায়, ধনের অভাব হলে ধন চায়, পীড়িত হলে ওষুধ চায়, সেইভাবে সর্বশক্তিময়ী বিশ্বজননীকে মানুষ তার সর্বপ্রকার অভাব জানিয়ে তা দূর করার জন্য প্রার্থনা জানায়, মায়ের নিকটসান্নিধ্য লাভ করে কৃতার্থ হতে চায়। চণ্ডীগ্রন্থে দেবীর কাছে প্রার্থনা করা হয়েছে—আপনার ত্রিনয়নশোভিত সৌম্য বদন আমাদের সকল ভৌতিক বিকার ও সর্বভূতের উপদ্রব থেকে রক্ষা করুক। হে কাত্যায়নি, আপনাকে প্রণাম :

''এতৎ তে বদনং সৌম্যং লোচনত্রয়ভূষিতম্।
পাতু নঃ সর্বভূতেভ্যঃ কাত্যায়নি নমোঽস্তু তে॥''

জননীর প্রতি এই যে নির্ভরতা, শরণাগতি তা আন্তর্য বা আন্তরিক সম্বন্ধের মাত্রানুসারে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়। 'স্থানে অন্তরতমঃ' (পাণিনিসূত্র, ১।১।৫০)—এই সূত্রের ভাষ্যে পতঞ্জলি বলেছেন : যে যার বিকার বা যার সঙ্গে স্থানত আন্তর্য আছে, সে তার সঙ্গে মিলিত হবার চেষ্টা করে। গোবৎস অন্য বৎসের সঙ্গে মিলিত হয়ে বহু দূরে গিয়ে বিচরণ করে, কিন্তু সূর্যাস্ত হলে নিজ নিজ গর্ভধারিণীর সমীপে আগমন করে। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও সে যার থেকে প্রসূত হয়েছে, তার ক্রোড় খুঁজে নেয়। কিন্তু যার সঙ্গে আন্তরিক সম্বন্ধ নেই, তার সঙ্গে সে মিলিত হতে চায় না, বরং তার প্রতি উপেক্ষা বা দ্বেষ প্রকাশ করে। পৃথিবীর বিকার লোষ্ট্র ঊর্ধ্বে নিক্ষিপ্ত হলে পৃথিবীতেই প্রত্যাবর্তন করে, অন্যত্র গমন করে না—''যেষামেব কিঞ্চিদর্থকৃতমান্তর্যং তৈরেব স হাসতে। তথা গাবো দিবসং চরিতবত্যো যো যস্যাঃ প্রসবো ভবতি তেন সহ শেরতে।... লোষ্ট্রঃ ক্ষিপ্তঃ বাহুবেগং গত্বা নৈব তির্যক্ গচ্ছতি নোর্ধ্বমারোহতি পৃথিবীবিকারঃ পৃথিবীমেব গচ্ছত্যান্তর্যতঃ''। অতএব যাঁর থেকে এই জগৎ সৃষ্টি হয়েছে সেই পরম

কারণের সঙ্গে কার্যরূপী জীবের মিলিত হবার ইচ্ছা তার অন্তরে গূঢ়ভাবে বিদ্যমান। সেই মিলনের ইচ্ছার বাহ্য অভিব্যক্তি হল পূজা।

দেবীমাহাত্ম্যে তিনি চণ্ডী নামে অভিহিতা। চণ্ড ধাতু স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয়যোগে চণ্ডী শব্দটি নিষ্পন্ন। চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাতীত পরব্রহ্ম। তাঁরই শক্তি চণ্ডী। সৃষ্টিকালে ব্রহ্মে যে জ্ঞান, বল, ক্রিয়া প্রভৃতি শক্তির প্রকাশ দেখা যায় তাকেই চণ্ডী বলা হয়েছে। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন। তাই চণ্ডী ব্রহ্মস্বরূপিণী। কেউ নির্বীর্য হয়ে থাকতে চায় না। মানুষ শক্তি অর্জন করতে চায় পূজার মাধ্যমে। পূজায় প্রথমে দেবীকে আবাহন করা হয়, পূজান্তে বিসর্জন দেওয়া হয়। আবাহন হল দেবীর সূক্ষ্মরূপ থেকে স্থূলরূপে প্রকাশ। আবার স্থূল থেকে সূক্ষ্মভাবে প্রত্যাবর্তনই বিসর্জন—আবাহনমভিব্যক্তিঃ শক্তিভাবো বিসর্জনম্ (সূতসংহিতা)। পূজা করতে গেলে প্রথমেই পঞ্চশুদ্ধির প্রয়োজন। পূজাস্থানকে পঞ্চগব্য, জল প্রভৃতির দ্বারা প্রক্ষালন, সম্মার্জন ও উপলেপ দ্বারা নির্মলীকরণ, তারপর ধূপদীপ-পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা শোভিত করাকে স্থানশুদ্ধি বলে। স্নান, প্রাণায়াম ষড়ঙ্গাদি দ্বারা আত্মশুদ্ধি হয়। মাতৃকাবর্ণ ও মূলমন্ত্রের উচ্চারণপূর্বক প্রোক্ষণ করলে ও ধেনুমুদ্রা দেখালে দ্রব্যশুদ্ধি হয়। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতময় শরীর পরমকারণ পরমাত্মার কার্য—এই ভাবনার দ্বারা বুদ্ধির শুদ্ধি হয়। শরীর সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে বিমল করা অর্থাৎ পরমাত্মাতে দেহবোধকে ডুবিয়ে দেওয়াই ভূতশুদ্ধি। ক্রমশ শুদ্ধীকরণ করতে করতে পূজক পূজ্যের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। তার পশুসত্তাকে প্রত্যাখ্যান করে দৈবীসত্তা জেগে ওঠে। এইভাবে পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার সংযুক্তির চেষ্টাই পূজা।

পূজার প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারায় বর্তমানে পূজায় ভাবের ন্যূনতা ও আড়ম্বরের আধিক্য দেখা যায়। পঞ্চদশ শতকে প্রথম জাঁকজমকপূর্ণ পূজা আরম্ভ করেন তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। তিনি সাড়ে আটলক্ষ টাকা ব্যয় করে শরৎকালে এই পূজা করেন। রাজশাহীর রাজা জগৎনারায়ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নয়লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাসন্তী দুর্গোৎসব করেন। কলকাতায় শারদীয়া দুর্গোৎসবের অন্যতম অনুষ্ঠাতা ছিলেন রাজা নবকৃষ্ণ দেব। কলকাতার আর একটি উল্লেখযোগ্য দুর্গাপূজা বড়িষার সাবর্ণ রায়চৌধুরিদের পূজা। হুগলির গুপ্তিপাড়ায় বারো জন ব্রাহ্মণ সাত হাজার টাকা চাঁদা তুলে ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রথম বারোয়ারি দুর্গোৎসব করেন। কলকাতায় বারোয়ারি দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে, ভবানীপুরে বলরাম বসু ঘাট রোডে। সনাতন ধর্মোৎসবসভার উদ্যোগে মহা ধুমধামে ওই পূজা হয়। ভারত স্বাধীন হলে সব রাজ্যেই শুরু হয় বারোয়ারি উৎসব।

এইসব পূজাই আড়ম্বরের পূজা। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ যে পূজা বেলুড়ে প্রবর্তন করেছিলেন তা হল ভাবের পূজা। বৈধী-ভক্তি সহকারে মা দুর্গাকে পূজা করলেও মৃন্ময়ী মূর্তির অন্তরালে স্বামীজী শ্রীশ্রীমার আলোকোজ্জ্বল সত্তাকেই অনুভব করতেন। স্বামী প্রেমানন্দের জননী স্বগৃহে দুর্গাপূজার আয়োজন করেছেন শুনে স্বামীজী স্বামী শিবানন্দজীকে চিঠিতে লেখেন : ''বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দ) মার বুড়োবয়সে বুদ্ধির হানি হয়েছে। জ্যান্ত দুর্গা ছেড়ে মাটির দুর্গা পূজা করতে বসেছে। দাদা, বিশ্বাস বড় ধন; দাদা, জ্যান্ত দুর্গার পূজা দেখাব, তবে আমার নাম। তুমি জমি কিনে জ্যান্ত দুর্গা মাকে যেদিন বসিয়ে দেবে, সেইদিন আমি একবার হাঁপ ছাড়ব।... তোমরা যোগাড় করে এই আমার দুর্গোৎসবটি করে দাও দেখি।''[১]

জনৈক ভক্ত স্বপ্নে দেখেছিলেন এক দেবীমূর্তি তাঁকে মন্ত্র দিচ্ছেন। স্বামীজী শুনে বললেন, ''ঐ মন্ত্র জপ করতে থাক্; পরে স্বশরীরে সেই মন্ত্রদাত্রী মূর্তি দেখতে পাবি। তিনি বগলার অবতার, সরস্বতীমূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।''[২] হরিশের দুর্বিনীত আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মায়ের সেই উগ্ররূপ প্রকাশিত হয়েছিল। অত্যাচার দেখলে তাঁর প্রবল তেজ উদ্‌গীর্ণ হত। একবার বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অভিযোগে পুলিশ সিন্ধুবালা দেবীকে গ্রেফতার করতে এসে নামের সাদৃশ্যের জন্য আর এক সিন্ধুবালা, যিনি ছিলেন অন্তঃসত্ত্বা, তাঁকেও গ্রেফতার করে। তারপর দুজনকে সেই রাত্রিতে হাঁটিয়ে এক কাছারিতে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে ট্রেনপথে বাঁকুড়া এবং পুনরায় হাঁটিয়ে দুমাইল দূরবর্তী থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনা

শুনে মা উত্তেজিত হয়ে বলেন—''এমন কোনও ব্যাটাছেলে কি সেখানে ছিল না যে দুই চড় দিয়ে মেয়ে দুটোকে ছাড়িয়ে আনতে পারত?'' মায়ের অগ্নিমূর্তি দেখে সকলে স্তম্ভিত হয়ে যান। আবার প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে সত্যাগ্রহী নারীপুরুষের ওপর পুলিশি অত্যাচারের কথা শুনেও মা অত্যন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দুর্গারূপিণী মা যেখানেই দুর্গতি দেখেছেন, তার প্রতিকারের জন্য তেজ প্রকাশ করেছেন।

আকারে ইঙ্গিতে মাঝে মাঝেই স্বয়ংবাদিনী মা তাঁর দুর্গাস্বরূপ ব্যক্ত করেছেন। একবার বেলুড় মঠে দুর্গাপূজায় তাঁর আসবার কথা। দরজায় মঙ্গলকলস ও কলাগাছ স্থাপন করা হয়নি দেখে দ্রুত সেই কাজ সম্পন্ন করার পরই দেখা গেল মায়ের গাড়ি এসে গেছে। মা সঙ্গিনীকে বললেন, ''সব ফিটফাট, আমরা যেন সেজেগুজে মা দুর্গা ঠাকুরুন এলুম।'' ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য লিখেছেন, ''কুলগুরুর নিকট দীক্ষিত হরিপদ মাঝিকে মা তাহার ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শুনাইতে বলেন। মার আদেশ পালন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে তাঁহাকে অশেষ-মহিমান্বিত শ্রীদুর্গারূপে প্রত্যক্ষ করিয়া ধন্য হয়।''[৩] নিজের গর্ভধারিণীর কাছেও মা একবার স্বরূপ প্রকাশ করেছিলেন। শ্যামাসুন্দরী দুঃখ করছিলেন—পাগল জামাইয়ের হাতে পড়ে সারদার সুখ হল না। সারদা দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, ''বারবার তুমি পাগল পাগল করোনি... একবার পতিনিন্দায় দেহ ছেড়েছি, আবার কি তুমি তাই দেখতে চাও?''[৪]

মায়ের স্বরূপ যথার্থ উপলব্ধি করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা। স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলতেন, ''ঘোমটা দিয়ে যেন সাধারণ মেয়েদের মতো থাকেন, অথচ মা সাক্ষাৎ জগদম্বা।''[৫] স্বামী প্রেমানন্দ বলেছেন, ''শ্রীশ্রীমা মনুষ্যদেহধারিণী হলেও তাঁর অপ্রাকৃত ভাগবতী তনু। জীবের কল্যাণের জন্য মনুষ্যবৎ লীলা করছেন।'' স্বামী শিবানন্দ বলেছেন, ''তিনি নিত্যাসিদ্ধা সেই আদ্যাশক্তির এক অংশ প্রকাশ, যেমন কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী ইত্যাদি।'' অন্যত্র বলেছেন, ''সেই জগজ্জননী অহৈতুকী স্নেহপরবশ হইয়া যে ভক্তকে একবার শ্রীকরকমল দ্বারা স্পর্শ করিয়াছেন—তাহার চৈতন্য হইয়াছে বা হইবেই হইবে, ইহা আমার পূর্ণ বিশ্বাস!''[৬] ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র শ্রীমাকে সাক্ষাৎ জগদম্বাজ্ঞানে পূজা করতেন। তিনি বলেছেন, ''মাতাঠাকুরাণীর মধ্যে জগন্মাতাকে অনুভব করলাম। তিনি জীবের উদ্ধারের জন্য আবির্ভূতা।''[৭]

অতিসাধারণ লোকের প্রতিও মা কখনও কখনও কৃপাবর্ষণ করেছেন। তাঁর পালকিবাহকের পুত্র শান্তিরাম শ্রীমাকে পিসিমা বলে ডাকতেন। তিনি শৈশবের একদিনের স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, ''পিসিমার নতুন বাড়িতে গিয়েছি। পিসিমা বাড়ির বারান্দায় বসেছিলেন... উঠে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে দেখলাম, পিসিমার মতো দেখতে, কিন্তু এ কোন্ পিসিমা? যুবতী, ঢলঢল দিব্য কান্তি, পিঠের দিকে চুল সব খোলা—যেন পায়ের কাছে ভুঁয়ে ঠেকে গেছে। ঠিক যেন মা-কালীর মতো।''[৮] সাতবেড়িয়া গ্রামের লালু জেলেও মায়ের স্নেহধন্য ছিল। একবছর লালু নবমীর দিন ঘটে দেবীপূজার ব্যবস্থা করেন। সন্ধ্যায় লালু দু-তিনটি গান হবার পর দেখলেন, পূজাস্থানে পিসিমার মতো কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে ভাবলেন ভুল দেখছেন। খানিক পরে আবার দেখেন দুয়ারে আলো-আঁধারির মাঝে সরু লালপেড়ে ধপধপে সাদা শাড়ি পরে পিসিমাই দাঁড়িয়ে। তিনবার ঘুরে ফিরে একই দৃশ্য দেখার পরে 'পিসিমা তোমার এত দয়া' বলে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। এদুটি ঘটনায় সন্দেহাতীতভাবে বোঝা যায় যে অমলিন সরলতা ও ভালোবাসাই মায়ের কৃপা আকর্ষণ করেছিল।

স্বরূপত তিনি দুর্গা হলেও জীবের কল্যাণের জন্য মানবীমূর্তি ধারণ করেছেন। দেবী দুর্গার দশপ্রহরণ তাঁর মানবীয় অবতরণে রূপান্তরিত হল দশটি আন্তর শক্তিতে—জ্ঞান, ক্ষমা, পবিত্রতা, ধৃতি, লজ্জা, তুষ্টি, ত্যাগ, সেবা, শান্তি ও মাতৃত্ব। স্বল্পপরিসরে এবিষয়ে আংশিক আলোকপাত করছি। তিনি যে জ্ঞানস্বরূপা তা ঠাকুরই জানিয়ে দিয়েছেন, ''ও সারদা, সরস্বতী জ্ঞান দিতে এসেছে।'' তাছাড়াও তিনি এসেছেন দয়া, করুণা, ক্ষমা দিয়ে জীবকে ত্রাণ করতে। মা নিজেই বলেছেন, ''আমার দয়া যার ওপর নেই সে নেহাত হতভাগ্য। আমার দয়া যে কার ওপর নেই বুঝি না—প্রাণীটা

পর্যন্ত।" বলরামবাবু মাকে বলতেন 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী'। মা বলেছেন, ''আমি কখনো দয়ায় আত্মহারা হয়ে যাই। ভুলে যাই যে আমি কে!''[৯] স্বামী বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে মায়ের এই বৈশিষ্ট্য অনুভব করেছিলেন বলে ভক্তদের প্রণাম করার সময় সাবধান করে দিতেন—''পাদস্পর্শ করো না। উনি এতই কৃপাময়ী, কোমলপ্রাণা, স্নেহাতুরা যে, কেউ ওঁর পাদস্পর্শ করলে উনি তৎক্ষণাৎ তার জ্বালা-যন্ত্রণাকে টেনে নেন নিজের মধ্যে। তার ফলে অপরের জন্য ওঁকে নিঃশব্দে ভুগতে হয়।"[১০]

শ্রীশ্রীমা স্বয়ং পবিত্রতা, তাঁর বন্দনায় স্বামী অভেদানন্দ বলেছেন : পবিত্রতাস্বরূপিণ্যে তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ। গঙ্গার ঘাটে ঠাকুর যোগীন মাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, যত অপবিত্র বস্তুই ভেসে যাক গঙ্গা যেমন অপবিত্র হয় না, তেমনি সাংসারিক অশুদ্ধির মধ্যে থেকেও মা নিত্যশুদ্ধা। তাঁর অসাধারণ ধৃতির পরিচয় পাওয়া যায় জাগতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সন্তানদের আবদার পালনের মধ্য দিয়ে। তাঁর লজ্জাপটাবৃতা মূর্তি ভাবী কালের সব নির্লজ্জ আচরণের মূর্ত প্রতিবাদ। তাঁর ষষ্ঠ আয়ুধ তুষ্টি ছিল সহজাত। জীবনে কোনওদিন অসন্তোষ প্রকাশ করেননি। দক্ষিণেশ্বরে নহবতের শত অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও বুকে যেন আনন্দের ঘট বসানো ছিল। ভক্তমহিলাদের বলেছেন, ''আমি তো কোনওদিন অশান্তি কি তা বুঝলাম না।" সপ্তম আয়ুধ ত্যাগ বা অনাসক্তির প্রকাশ দেখা গেছে লক্ষ্মীনারায়ণ মাড়োয়ারির দশ হাজার টাকা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে। কামারপুকুরে আত্মীয়রা তাঁকে ফসলের ভাগ না দেওয়ায় সেবিকা বাসনাবালা ক্ষুব্ধ হলে পরম নির্লিপ্ত মায়ের উত্তর : ''দু মুঠো চাল নিয়ে যদি ওরা খুশি হয় তো নিক না।" ঠাকুর সংসারী ভক্তদের মনে ত্যাগ করার যে উপদেশ দিয়েছিলেন, শ্রীমা তা বাস্তবে রূপায়িত করলেন। তাঁর অষ্টম আয়ুধ সেবা। জীবসেবার যে উজ্জ্বল আদর্শ তিনি স্থাপন করেছেন, তা আমাদের পথচলার দিঙ্‌নির্দেশ করে। জয়রামবাটীতে গৃহী-সন্ন্যাসী-নির্বিশেষে সকলের উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার করতেন তিনি। ভক্তসেবার জন্য স্বয়ং গ্রাম থেকে শাকসবজি সংগ্রহ করে মাথায় বয়ে এনেছেন যেন স্বয়ং শাকম্ভরী দেবী; জীবধাত্রীরূপে সবার তুষ্টি ও পুষ্টির আয়োজন করছেন। বাড়ির রাখাল বালকটির চর্মরোগ হলে স্বহস্তে ওষুধ প্রস্তুত করে দিয়েছেন। প্রতিবেশী বিধবা বউয়ের কানের ক্ষত নিজে নিমপাতার জল দিয়ে ধুয়ে দিয়ে এসেছেন, কোয়ালপাড়ায় রেখে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। বউটি না বাঁচলেও মায়ের সুব্যবস্থায় মৃত্যুর আগে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল। অক্ষয় কুমার সেনের প্রেরিত যে শ্রমজীবী মেয়েটি মায়ের বাড়িতে এসে অসুস্থতাবশত বিছানা ময়লা করে ফেলেছিল, করুণাময়ী মা সকালে কেউ ওঠার আগে তাকে জলখাবার দিয়ে রওনা করিয়ে দিয়ে নিজেই সব পরিষ্কার করে ফেললেন, কেউ কিছু বুঝতে পারল না। এভাবেই জগজ্জননী নীরবে সর্বকল্যাণ সাধন করেছেন। নবম আয়ুধ শান্তির দ্বারা তিনি সকলের অশান্তি দূর করেছেন। ভূরি ভূরি এর প্রমাণ মেলে। ভগিনী নিবেদিতা অন্তরে অন্তরে মায়ের এই শান্তিরূপকে অনুভব করে পত্রে প্রকাশ করেছেন। মায়ের সান্নিধ্যকে সন্ধ্যাতারার আলো, চাঁদের উদয় আর প্রার্থনার সুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। ১৯১০ সালের ১১ ডিসেম্বর মাকে তিনি লিখেছেন : ''তোমার ভালোবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই। তা পৃথিবীর ভালোবাসা নয়, স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারও।" শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবতাদের প্রার্থনা : ''খড়্গশূলগদাদীনি যানি চাস্ত্রাণি তেঽম্বিকে।/ করপল্লবসঙ্গীনি তৈরস্মান্ রক্ষ সর্বতঃ"—হে জননি, তোমার করপল্লবধৃত অস্ত্রের দ্বারা আমাদের রক্ষা করো। শ্রীশ্রীমা তাঁর সহজাত আয়ুধগুলির দ্বারা যেন দশদিকে সন্তানদের ঘিরে রেখে তাদের শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করছেন।

সমস্ত গুণকে অতিক্রম করে বড়ো হয়ে উঠেছে তাঁর মাতৃত্বশক্তি, সেখানে তিনি অনন্যা। তিনি নিজের জগন্মাতৃত্ব স্বমুখে প্রকাশ করেছেন। একবার মা ভক্তমহিলাদের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে বলছেন, ''আমার ওপর রাধির অত্যাচার দেখে আমার মা অস্থির হয়ে

যেত। বলত, নিজের পেটে তো একটা হল না, যত সব পরের ঝঞ্ঝাট নিয়ে কেমন করে যে হাসিমুখে থাকিস বাপু তা বুঝিনে।" শুনে এক ভক্ত মেয়ে হাসতে হাসতে বলেন, ''আচ্ছা মা, আজ যদি দিদিমা থাকতেন তাহলে আরও কত অধৈর্য হতেন। আজ কত ছেলেমেয়ে মা মা বলে এসে আপনাকে বিরক্ত করছেন। আমরাও তো আপনার পেটে হইনি, তা বলে কি আমরা আপনার ছেলেমেয়ে নই?" একথা শুনে মা সোজা হয়ে উঠে বসে তপ্তস্বরে বললেন, ''কি বললে, আমার পেটে হওনি, তবে কার পেটে হয়েছ? আমার ছেলেমেয়ে নও, তবে কার ছেলেমেয়ে? আমি ছাড়া মা আর কেউ আছে নাকি! সব মেয়ের মধ্যেই আমি, সব মায়ের ভেতরেই আমি রয়েছি। যে যেখান থেকেই আসুক, সবাই আমার ছেলেমেয়ে এটা সত্যি সত্যি জানবে।"[১১]

চণ্ডীতেও এই তত্ত্ব প্রকাশ করে বলা হয়েছে, 'সৈব বিশ্বং প্রসূয়তে'। তিনিই বিশ্বপ্রসবিনী। মায়ের এই স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে ঋষিরা অবহিত ছিলেন তাই তাঁকে স্তুতি করে বলেছেন, 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।' 'ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বৈতৎ'—সকল নারীই আপনার বিগ্রহ। জননীরূপা আপনিই এই জগতের অন্তরে বাইরে পরিব্যাপ্ত। জগদম্বা নিজেই ঘোষণা করেছেন—'একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা'—এজগতে একমাত্র আমিই বিরাজিতা। চণ্ডীর শান্তনবী টীকায় আছে,

''জগতো নাহমন্যাং স্যাং স্যাৎ মদন্যৎ জগৎ চ ন।
জগতো মম চাপৈক্যাৎ ব্যক্তিরন্যা ততোঽস্তি কা॥"

—আমি জগৎ থেকে পৃথক নই, জগৎ মদ্‌ব্যতিরিক্ত নয়। আমি এবং জগৎ শক্তিত অভিন্ন বলে আমার অতিরিক্ত কেউ জগতে নেই।

সন্তানের কল্যাণের জন্য মা অনাদিকাল থেকে এইভাবে তাঁর স্বরূপ ব্যক্ত করে চলেছেন। দুর্বলমতি, অস্থিরচিত্ত মানুষ বারবার তাঁর স্বরূপ অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়ে নিজেকে সহায়হীন মনে করে বিভ্রান্তি ও দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। বারবার তিনি অবতীর্ণ হয়ে আশ্বাস দিয়েছেন—''সর্বদা ভাববে আর কেউ না থাক, আমার একজন মা আছেন।"

এই মায়ের সেবাপূজায় সব সন্তানের সমান অধিকার। শুধু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় নয়; শূদ্র, অন্যান্য ম্লেচ্ছ সম্প্রদায় এবং দস্যুরাও দেবীপূজা করেন। শ্রীশ্রীমা সারদার পূজাতে যেমন এগিয়ে এসেছেন উচ্চবর্ণের মেধাবী ও ভক্ত সন্তানরা; অপরদিকে তেলোভেলোর মাঠের বাগদি ডাকাত, তুঁতে ডাকাত আমজাদও মায়ের চরণে শান্তিময় আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে। ভগিনী নিবেদিতা, সারা বুল, জোসেফিন ম্যাকলাউড, ক্রিস্টিন প্রমুখ বিদেশিনীরা শ্রীমাকে দেবীতমারূপেই অন্তরের ভক্তি জানিয়েছেন। সৃষ্টির আদি জননী দুর্গা ও শ্রীশ্রীমা যে স্বরূপত অভিন্ন তা মনেপ্রাণে অনুভব করে তাঁর চরণে আত্মনিবেদন করতে পারলেই মানুষ জৈবিক সত্তাকে অতিক্রম করে দিব্য চেতনা লাভ করতে পারবে। ✠

তথ্যসূত্র

১। স্বামী বিবেকানন্দ, *পত্রাবলী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০০), পৃঃ ২৫৬-৭

২। ব্রহ্মচারী অক্ষয়চৈতন্য, *শ্রীশ্রীসারদা দেবী* (ক্যালকাটা বুক হাউস : কলকাতা, ১৩৭৪), পৃঃ ১৫৬

৩। তদেব, পৃঃ ১৬২

৪। শ্রীদুর্গাপুরী দেবী, *সারদা-রামকৃষ্ণ* (শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম : কলকাতা, ১৩৬১), পৃঃ ৪২০

৫। মানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, *শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০২), পৃঃ ২২৩

৬। তদেব, পৃঃ ২২৫

৭। কুমুদবন্ধু সেন, *স্মৃতিকথা* (রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রম : হাওড়া, ২০০১) পৃঃ ১০ [এরপর, *স্মৃতিকথা*]

৮। সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ১৯৯৮), খণ্ড ৩, পৃঃ ৭০০

৯। *মায়ের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০৩), অখণ্ড, পৃঃ ১৭৪

১০। *স্মৃতিকথা*, পৃঃ ১৪

১১। *শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে*, খণ্ড ৩, পৃঃ ৬৮১